Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-IX, Issue-I, October 2020, Page No.99-105
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

উনিশ শতকের সমাজ বাস্তবতায় নারী প্রেম: মহিলা কবির কলমে

ড. তারক পুরকাইত
শিক্ষক, নসিবপুর উচ্চ বিদ্যালয়(উঃমা), নসিবপুর, সিঙ্গুর, হুগলী

Abstract:

Nineteenth Century was the age of rise and fall. On the side, there was reformation of heritage and on the contrary,it was the Daniel of heritage by the people received on the light of Renaissance. All these were happened centralising on the life of women. The women of nineteenth century were deprived of many things. Yet they had no lack of talent. They wrote down their miseries and suffering whenever they got opportunity. Poetess like Mankumari Basu, Girindramohini Dasi, Kamini Roy, Swarnakumari Devi etc composed the verses of love about their husband. It is groundless to justify whether those poems attained artistic craftsmanship. It is not less worthy that they revealed their true identity through their poetry.

Key Words: 19th century Renaissance, Position of women in 19th century, Poetess in the view of men, Specially of Poetess, Love in the Writing of Poetess.

উনিশ শতক ভাঙা গড়ার কাল। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির অভিঘাতে বিপর্যস্ত বাঙালি সেদিন মধ্যযুগীয় কুসংস্কার ও অন্ধতার বৃত্ত থেকে মানবতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের পথে হাঁটতে শুরু করল। নবজাগরণের আলো ছড়িয়ে পড়ল বাংলায়, বিশেষ করে শহর কলকাতায়। দীর্ঘদিনের অভ্যাসে মরচে পড়া বাঙালি সমাজের ব্ল্যাকহোলগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠল। নবজাগরণের আলো পড়তেই সনাতনী ভাবনার কঙ্কাল বেরিয়ে পড়ল। উনিশ শতকের দ্বন্দ্বমুখর কালে পুরাতনি ঐতিহ্যের সঙ্গে নবীন ভাবনার দড়ি টানাটানি শুরু হল। ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালি সেদিন ব্যক্তিমানুষ আর মানবতাকে গুরুত্ব দিয়ে নবজীবনের গানে মুখর, অন্যদিকে প্রাচীনপন্থীরা দৈবী ভাবনা ও সংস্কারের সনাতনী পন্থায় পথ চলতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সতীদাহপ্রথা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, নারীকে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত করা, নারীকে পর্দানশীন করে রাখা - সর্বত্র কেন্দ্র বিন্দুতে অবস্থান করেছে নারী। তাই নবজাগরণের আলোয় শিক্ষিত বাঙালি নারী মুক্তির পথ খোঁজার চেষ্টায় আন্দোলনের পথে পা বাড়ালেন। বহুবিবাহ রদ, বাল্যবিবাহ রদ, বিধবাবিবাহ প্রচলন, নারী শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন - প্রভৃতির মাধ্যমে নারীকে তার স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা ছিল এই সময়ের আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের প্রধান উদ্দেশ্য। যে নারীকে আমরা আবহমান কাল ধরে দেবী রূপে পূজা করে এসেছি, সেই নারীকেই আমরা অবলা বলে দূরে সরিয়ে রেখেছি - তাকে পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির ন্যায় গৃহ খাঁচায় বন্দি করে রেখেছি দীর্ঘকাল। এরকম এক সংকট কালে রামমোহন, বিদ্যাসাগারের মতো মানবদরদি

যুগপুরুষদের আবির্ভাবে নারী তার দীর্ঘদিনের হাহাকার ও বন্ধনের স্নেহপাশ ছিন্ন করে; কেবল নারী হিসেবে নয়, মানুষ হিসেবে বাঁচার স্বপ্ন সৌধ নির্মাণ করতে শিখল।

প্রবন্ধের মূল বিষয়ে প্রবেশের পূর্বে উনিশ শতকে নারীর অবস্থান কেমন ছিল তার একটা স্পষ্ট চিত্র আমরা দেখে নিতে পারি। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষ নির্দিষ্ট করে দেয় নারী কেমন হবে — তার আদর্শ। সেকালে গৌরীদান প্রথা তখনও অক্ষুন্ন। বিবাহের পর খুব অল্প বয়সেই মেয়েরা আবদ্ধ হয়ে পড়ত গৃহের গণ্ডীর মধ্যে। জড়িয়ে পড়ত গৃহ, গৃহধর্ম আর গৃহকর্মের বন্ধনে। পতিপ্রেম, গৃহিণীপনা, সতীত্ব, সন্তানপালন, গুরুজনের সেবা — এরই মধ্যে আবর্তিত ছিল নারীর জীবন কাল।[১] তার আশা নেই, আকাঙ্খা নেই, পাখা মেলে আকাশে ওড়বার অবসর নেই। এমনকি শিক্ষাদীক্ষা থেকেও সে বঞ্চিত। সমাজ, সংসার, পরিবার ছাড়া তার কোনও ভাবনার জায়গা নেই। এর ফলে দুঃখের যে অন্তঃসলিলা তাদের অন্তরে সদা প্রবহমান ছিল তারই প্রকাশ আমরা লক্ষ্য করি বাংলা সাহিত্যের প্রথম আত্মজীবনীকার রেভারেন্ড লালবিহারির মা রাসসুন্দরী দেবীর কলমে - 'লোকে আমোদ করিয়া পাখি পিঞ্জরে বন্ধ করিয়া রাখিয়া থাকে। আমার যেন সেই দশা ঘটিয়াছে। আমি ঐ পিঞ্জরে এ জন্মের মতো বন্দী হইলাম, আমার জীবদ্দশাতে আর মুক্তি নাই।"[২] (আমার জীবন) সেই সময়ের নারীর জীবন যন্ত্রণার কথা প্রকাশ পেয়েছে আরও এক নারীর কলমে — "আমরা এত পরাধীন যে আশা যাহাকে বলে তাহাও করিতে পারি না, আজকাল কোন একটি বিষয়ে আশা করিবামাত্রই যেন অন্তর হইতে কে বলিয়া ওঠে - অবলে, পরাধীন হইয়া ও প্রকার বিষয়ের আশাকে মনে স্থান দিও না, যেহেতু তজ্জন্যে অধিকতর ক্লেশে ক্লেশিতা হইবে। হে পিতঃ! আমাদিগকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্যই কি সৃষ্টি করিয়াছ? মাতঃ পৃথিবী! এ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না।" — বামাসুন্দরী, ভারতবর্ষীয় রমণীগণের দুরবস্থা মোচনের উপায় কী?(সোমপ্রকাশ, ১০ ভাদ্র ১২৬৯)।

সমাজে যখন নারীর অবস্থান নিম্নগামী, সমাজ যখন নারীকে অর্গলবদ্ধ করে রেখেছে, সমাজ যখন কেড়ে নিয়েছে নারীর অধিকার — ঠিক তখনই নারীর মনের কথাকে প্রকাশের সুযোগ করে দিল বেশ কিছু পত্র পত্রিকা। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে প্রকাশিত হল মহিলাদের জন্য পত্র পত্রিকা। বিশেষকরে বামাবোধিনী, ভারত মহিলা, বঙ্গ মহিলা, অনাথিনী, হিন্দু ললনা, পরিচারিকা, বঙ্গবাসিনী, গৃহ লক্ষ্মী, ভারত লক্ষ্মী, অন্তপুর প্রভৃতি পত্রিকায় মেয়েরা আত্মপ্রকাশের সুযোগ পেল। মেয়েদের লেখালেখির বিষয়টি অনেক শিক্ষিত পুরুষ মেনে নিতে পারেন নি। সেই সময়ে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সম্পাদক সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়ের কাব্যগ্রন্থের সমালোচনায় লেখেন[৩] - 'স্ত্রী লোকের কবিতার বেশী প্রশংসা করিতে আমরা ভয় পাই — পাছে উৎসাহ দিলে গৃহিণীর দল, গৃহকর্ম ছাড়িয়া সকলেই কাগজকলম লইয়া বসেন! তাহা হইলে গরীব পুরুষের দল এক মুঠা অন্ন পাইবে না। অতএব মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায় আমাদের মার্জনা করিবেন — আমরা একটু কম করিয়া প্রশংসা করিব" (১৮৮২)।

উনিশ শতকে মেয়েরা যখন কবিতা রচনার উদ্যোগ করল, নিজেকে আর নিজের ভাবনা চিন্তাকে প্রকাশ করার তাগিদ অনুভব করল তখন তাদের সামনে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুশাসন যেমন ছিল, তেমন ছিল ঐতিহ্যের সংস্কার। সব কিছু মিলিয়ে এক দ্বন্দ্বমুখর জটিল অবস্থান নারীদের; একদিকে প্রাচীন, অন্যদিকে নবীন — এই দুয়ের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হতে হয়েছিল নারীকে। বাংলা সাহিত্যে তখন গীতিকবিতার আবির্ভাব ঘটে গেছে। কিন্তু অনেক সময় নারীকে তার ভাবনার অনেক কিছু অবদমিত করে কবিতা রচনা করতে হয়েছে। বিশেষত যৌন ভাবনামূলক কোন ব্যক্তিগত উচ্চারণ যা তার পক্ষে চিন্তা করাও পাপ বলে বিবেচিত হয়, সেখানে সরাসরি ইন্দ্রিয়জ কোন ভাবনা তার কবিতায় প্রকাশিত হবে - এ ভাবনা সুদূর অতীত। সেই সঙ্গে সামাজিক নীতিবোধের প্রশ্ন তার সংকোচের বিহ্বলতায় আচ্ছন্ন করল। আর এক সমস্যাও ছিল মহিলা

কবিদের সামনে - তা হল তাদের সামনে নারীবাদী কবিতার কোন পূর্ব আদর্শ ছিল না। মহিলা কবিরা নিজেরা নিজেদের মত কবিতার ভাষ্য নির্মাণ করলেন। তবে বহু শতাব্দীব্যাপী পুরুষ রচিত সাহিত্যের ঐতিহ্যের পাশে তাদের রচনা যে অকিঞ্চিৎকর হয়ে পরবে এ ব্যাপারে তারা নিশ্চিত ছিলেন। আমাদের মহিলা কবিরাও এমন মানসিকতা পোষণ করতেন — নিজেদের কবিতাকেই তারা অকিঞ্চিৎকর ও ক্ষুদ্র বলে অভিহিত করেছেন[৪] -"ক্ষুদ্র হই লজ্জা কি তাহাতে ?/আমি ক্ষুদ্র রূপে রব/ অগণ্য নগণ্য জন সাথে।' কামিনী রায়, অলজ্জিত, (দীপ ও ধূপ)।

উনিশ শতকে প্রসন্নময়ী থেকে গিরিন্দ্রীমোহিনী- মানকুমারী- মোক্ষদায়িনীকে একসময় 'মহিলা কবি' বলে কখনও তাচ্ছিল্য, কখনও অত্যধিক প্রশংসা করা হয়েছে। বিস্ময়কর ঠেকবে 'সাহিত্যের সাত সমুদ্রের নাবিক' প্রিয়নাথ সেন যখন মন্তব্য করেন[৫] "আমাদের কোন স্ত্রী-কবিরই লেখায় আমি কবিত্বের সুস্থ সুন্দর বিকাশ দেখি নাই — মৌলিকতা ত নাই-ই। কেহই ঠিক সুরটি লাগাইতে পারেন নাই —কাঁচা ভাষা — অপরিণত ভাব — কাব্যকলার মধ্যে আমরা যে পূর্ণতা — উচ্ছ্বাসের সঙ্গে যে সংযম দেখিতে চাই তাহা কাহারও নাই।' তবুও উনিশ শতকের মহিলা কবিরা তাদের মর্‌ম কথাকে কবিতার ভাষায় প্রকাশ করেছেন। হয়তো তাদের কবিতায় মৌলিকতা ও কবিত্বের অভাব আছে, হয়তো তাদের ভাষা কাঁচা, ভাব অপরিণত, হয়তো তারা তাদের উচ্ছ্বাসকে সংযমের বাঁধনে বাঁধতে পারেন নি; কিন্তু তারা যে কবিতার মাধ্যমে তাদের অস্তিত্বের জানান দিচ্ছিল — সেটাই বা কম কি!

গিরিন্দ্রীমোহিনী দাসী, মানকুমারী বসু, কামিনী রায়, নগেন্দ্রবালা মুস্তাফী, সরোজকুমারী দেবী, প্রিয়ংবদা দেবী প্রমুখ কবিরা প্রেম কবিতার মধ্য দিয়ে নারীর মর্মবেদনা ও বিষাদঘন মনের পরিচয় ফুটিয়ে তুলেছেন। যার মধ্যে একটা নৈরাশ্যের সুর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করতে পারি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর নাম। ছাব্বিশ বছর বয়সে বৈধব্য জ্বালা নিয়ে দাম্পত্য প্রেমের মনিহার রচনা করেছেন কবি। অবশ্য স্বামী হারানোর বিরহ শোনা গেছে তাঁর কবিতায়। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কবিতাহার' (১৮৭৩)। পরবর্তী কাব্যগ্রন্থগুলি হল 'ভারত কুসুম' (১৮৮২) 'অশ্রুকণা' (১৮৮৭) , 'আভাষ' (১৮৯০) , 'শিখা' (১৮৯৬), 'অর্ঘ্য' (১৯০২), 'স্বদেশিনী' (১৯০৬), 'সিন্ধুগাথা' (১৯০৭) প্রভৃতি। কবি রচিত 'ভারত কুসুম' কাব্যের 'পতিভক্তি' কবিতাটি স্বামীর প্রতি স্ত্রীর আত্মনিবেদনের ভারতীয় ঐতিহ্যকে গৌরবান্বিত করে লেখা।[৬] দাম্পত্য প্রেম কবিতায় কবি যুগল প্রেমের মাধুর্য ও পবিত্রতার কথা বলেছেন। নদীর প্রতি কবিতায় কবি নদীকে অসতী বলে তিরস্কার করেছেন। কেন না সে তার দয়িতসাগরকে অগ্রাহ্য করে মলয়ের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে।

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর 'অশ্রুকণা' কাব্যের অনেক কবিতা মৃত স্বামীর প্রতি স্মৃতি তর্পণ। মৃত স্বামীর স্মৃতিতে বিধুর কবি 'কোথায়' কবিতায় তাঁর মর্মবেদনা ব্যক্ত করেন এইভাবে -

কোথায় গিয়েছে, কোথায় রয়েছে
পাব কি আবার হায় !
দেহান্তে কি আছে ? কে মোরে বলিবে !
দেহান্তে পাব কি তায়!"

'অশ্রুকণা'র অন্তর্গত 'অশ্রু', 'একাদশী নিশি', 'মনে পড়ে তায়', 'বিরহিনী' প্রভৃতি কবিতায় স্বামীর প্রতি প্রেমের একনিষ্ঠ ভাব প্রকাশিত । অশ্রুকণার কথা বলতে গিয়ে কবি মূলত শোকাশ্রুর কথা ব্যক্ত করেছেন — 'এ শোকাশ্রু !/ নিরাশার যাতনা — গরল-ঢাকা । / এ শোকাশ্রু/বাসনার অনন্ত পিপাসা-মাখা।' হৃদয়ের কোণে নৈরাশ্যের মেঘ ছায়ায় চোখের কোনে জন্ম নেওয়া এ শোকাশ্রু কবির আশাহত বেদনার

আর্তনাদ। 'আভাষ' কাব্যেও বেদনা ও নৈরাশ্যের সুর ধ্বনিত। তাঁর স্বামী আজ তাঁর কাছে নেই। তিনি আছেন অমৃতলোকে। আর একাকিনী বিরহিনী কবি প্রিয়তমের দেশে পাড়ি দিতে চান — 'বসে ওই মেঘের পরে সাধ করে সই যাইল ভেসে।'

উনিশ শতকের মহিলা কবিদের মধ্যে অন্যতম পরিচিত মুখ মানকুমারী বসু। তাঁর প্রথম সাহিত্য সৃষ্টি সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় প্রকাশিত অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত পুরন্দরের প্রতি ইন্দুবালা নামক কবিতা। মাত্র একুশ বছর বয়সে স্বামীর মৃত্যুতে বৈধব্য যন্ত্রণায় কাতর হয়ে রচনা করেন 'প্রিয় প্রসঙ্গ' বা 'হারানো প্রণয়' (১৮৮৪) কাব্যগ্রন্থটি। মানকুমারী রচিত অন্যান্য কাব্যগুলি হল - 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' (১৮৯৩), 'কনকাঞ্জলি' (১৮৯৬) , 'বীরকুমার বধ কাব্য' (১৯০৪) প্রভৃতি। 'বঙ্গের মহিলা কবি' গ্রন্থের রচয়িতা যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মানকুমারীর কাব্যে 'পতিবিয়োগ বিধুরা মহিলা কবির অন্তর্বেদনা'[৭] লক্ষ্য করেছেন। তাঁর কবিতায় যে প্রেম ভাষা পেয়েছে তা নরনারীর সমাজ-শাসিত প্রেম। তিনি প্রেমের ইন্দ্রিয়জ চেহারা বা রুপকল্প নির্মাণ করা থেকে বিরত থেকেছেন ও আদর্শায়িত প্রেমের কথাই আমাদের শুনিয়েছেন। তাঁর 'প্রিয় প্রসঙ্গ' কাব্যের 'শোকোন্মাদ অবস্থায়' কবিতায় মৃত স্বামীর প্রতি ভালোবাসা ও সেই সঙ্গে বিরহের হাহাকার লক্ষ্য করি — 'কিবা দিবা কিবা নিশি/ বিজন কাননে আসি,/বিরলে নয়ন জলে বদন ভাসাই,/ কি শেল বেজেছে প্রাণে/ আপনি অনল জ্বালি আপনি নিবাই!।' কবি 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' কাব্যের 'মৃত্যু সুহৃদ' কবিতায় প্রেমকে মৃত্যুর সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন - "আমি তারে চিনি শুনি ভালোবাসি তায় /শুনিলে তাহারি নাম,/উথলে হৃদয় ধাম/পরাণ শিহরি উঠে সুধা পড়ে পায়;/.....পরাণে বেঁধেছি পাছে ফেলে চলে যায়,/তার নাম মৃত্যু আমি ভালবাসি তায়'।" আমাদের মানতেই হয় সামাজিক অনুশাসনের ভয়ে মানকুমারী বসুকে সতর্ক থাকতে হয়েছে, যাতে ইন্দ্রিয়জ কামনা বাসনার প্রকাশ না ঘটে কবিতায়। কিন্তু মাঝে মাঝেই তাঁর কবিতায় শরীরী ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। যেমন 'আপনি অনল জ্বালি আপনি নিবাই!' এবং 'পরাণ শিহরি উঠে সুধা পড়ে যায়' - এই লাইন দুটি কিসের উচ্চারণ? এতো অতৃপ্ত দেহজ কামনা বাসনার সংরাগময় অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ! কবি সখিকে উদ্দেশ্য করে কখনো কখনো প্রেম নিবেদন করেছেন — 'যারে আমি মোর বলি, সেই নাহি আসে কাছে,/ তাই ভয় করে সখি! তুমি ফাঁকি দাও পাছে! / এখনো রয়েছি বেঁচে ওই মুখ পানে চেয়ে, /এ দেহে শোণিত বহে তোমারি বাতাস পেয়ে।' - সখী, কনকাঞ্জলি।

উনিশ শতকের মহিলা কবিদের মধ্যে জনপ্রিয় কবি হলেন কামিনী রায় (সেন)। পিতা বিখ্যাত সাহিত্যিক চণ্ডীচরণ সেন। গিরীন্দ্রমোহিনী, মানকুমারী বসু প্রমুখ মহিলা কবিরা ছিলেন স্বশিক্ষিত। তাঁরা স্কুল কলেজে পড়ার সুযোগ পান নি। কিন্তু কামিনী রায় স্কুল কলেজে পড়ার সুযোগ পেয়েছেন। বেথুন স্কুল থেকে প্রবেশিকা (১৮৮০) , এফ এ (১৮৮৩) ও সংস্কৃত অনার্স নিয়ে বিএ (১৮৮৬) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে তিনি বেথুন স্কুলে (১৮৮৬-৯০) ও বেথুন কলেজে (১৮৯০-৯৪) পড়িয়েছেন। কামিনী রায় বয়সে রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা এবং রবীন্দ্রনাথ কিছুটা পরিচিত লাভ করার পরই তিনি কাব্য সাধনায় প্রবৃত্ত হন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আলো ও ছায়া' (১৮৮৯)। কাব্যটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি শিক্ষিত পাঠক মহলে সমাদৃত হন। তাঁর রচিত অন্যান্য কাব্যগুলি হল — নির্মাল্য (১৮৯১), পৌরাণিকী (১৮৯৭), মাল্য ও নির্মাল্য (১৯১৩), অশোক সঙ্গীত (১৯১৪), দীপ ও ধুপ (১৯২৯) প্রভৃতি। সুকুমার সেন লিখেছেন "কামিনী রায়ের কবিতার ভাষা সরল, সংযত এবং পরিমিত। ভাবের সঙ্গে ভাষায় সংযম ও শালীনতা ইঁহার রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য।"[৮]

'আলো ও ছায়া'র অনেক কবিতায় কবি দয়িতের সঙ্গে স্পষ্ট প্রেমালাপ করেছেন। এত অনাবিল স্পষ্টতা ও সংকোচহীন প্রেম ভাষণ খুব কম মহিলা কবি উচ্চারণ করার সাহস দেখাতে পেরেছেন। এ প্রসঙ্গে 'বিদায়ে',

'প্রণয়ের ব্যথা', 'মুগ্ধপ্রণয়,' 'নিরাশ' প্রভৃতি কবিতা উল্লেখযোগ্য। 'নিরাশ' কবিতায় কবি জানিয়েছেন — "তোমার গৌরবে গর্ব ,তোমারি সুখেতে সুখ, /তোমারি বিষাদে নাথ, ভাঙ্গিয়া যাইবে বুক।/তোমার হৃদয়ে শান্তি , তুমি ভালবাস তাই /আমার প্রাণের তৃপ্তি, অন্য আকাঙ্খিত নাই'। আবার বিচ্ছেদের ব্যথাঘন মুহূর্তটি যা ধরা আছে 'বিদায়ে' কবিতায় —" বিদায়ের উপহার অশ্রুভার দিবে, / একবার চাহিবে না হেসে? / জান নাকি, শূন্য প্রাণে যাইতে হইবে/ নিতান্তই ভিখারীর বেশে?/ আনন্দ আরাম শান্তি রাখি তব কাছে/ দেহ লয়ে চলিয়াছি — হিয়া ফেলি পাছে।' কামিনী রায় ছাত্রী থাকাকালীন কাদম্বরী পড়েছিলেন। পরবর্তীকালে এই বিষয়কে অবলম্বন করে 'আলো ও ছায়া' কাব্যে 'মহাশ্বেতা' ও 'পুণ্ডরীক' নামে দুটি দীর্ঘ কবিতা রচনা করেন। যে সহপাঠীর সঙ্গে কাদম্বরী পড়েছিলেন তাঁকে প্রথম কবিতা উৎসর্গ করে যে ছোট উৎসর্গ কবিতা লেখেন তার পিছনে রয়েছে প্রত্যাখ্যাত প্রেমের করুণ দীর্ঘশ্বাস - 'তুমি আমি দূরে দূরে আজ, সতীর্থ আমার/ একসাথে সে কাননে মোরা পশিব না আর/ একলাটি বসে থাকি যবে আধেক নিদ্রায়,/ অচ্ছোদের তরুণ তাপসী দেখা দিয়ে যায়। / হেরি তার সজল নয়ান, শুনি মৃদু কথা,/ বুঝি তার প্রণয় গভীর নিদারুণ ব্যথা।' পুণ্ডরীকের সঙ্গে মহাশ্বেতার প্রথম সাক্ষাতের পর বাড়ি ফিরে তার মনের যে বর্ণনা কামিনী রায় দিয়েছেন, সেখানে রোমান্টিক প্রেমের উৎসার ঘটেছে — 'ফিরিলাম গৃহে। এক নতুন বিষাদে/ সুখের জীবন মম করিল আঁধার।/জননী বিস্মিত নেত্রে চাহি মুখপানে / জিজ্ঞাসিল,- কি হয়েছে বাছারে আমার? / নারিনু কহিতে কিছু, বরষিল আঁখি /অবিরল অশ্রুধার। জননীর কোলে/ নীরবে লুকায়ে মুখ রহিনু কাঁদিতে।' অবশ্য রবীন্দ্রনাথ কামিনী রায়ের কবিতায় ভাষায় সংগীতের অভাব লক্ষ করেছেন। এমনকি 'মহাশ্বেতা'র মতো কবিতাও তাঁর মনে হয়েছে 'ভাল করে জ্বলে ওঠেনি'।[৯]

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, মানকুমারী বসু, কামিনী রায় — উনিশ শতকের এই তিন প্রধান মহিলা কবি ছাড়া আরও অনেক অপ্রধান মহিলা কবি তাঁদের কবিতার মধ্য দিয়ে প্রেম ভাবনার বিচিত্র ভাব তরঙ্গ প্রকাশ করেছেন। এ বিষয়ে নগেন্দ্রবালা মুস্তাফীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নগেন্দ্রবালা তাঁর 'মর্মগাথা' (১৮৯৬), 'প্রেমগাথা' (১৮৯৮) , 'অমিয়গাথা' (১৯০১) — 'এই তিন কাব্যগ্রন্থে প্রেমের নানা বিচিত্র বিলাস ও মানস-প্রতিক্রিয়া লিপিবদ্ধ আছে। নগেন্দ্রবালার প্রেমকবিতা বঙ্গনারীর স্বামীচরণে কবিতাপুষ্প উপহার নহে; ইহা যথার্থই প্রেমকবিতা; দয়িতের প্রতি প্রেমিকার নানা আকর্ষণ-বিকর্ষণের সুন্দর প্রকাশ।"[১০] 'মর্মগাথা' কাব্যের 'নীরবে' কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে বিরহিণীর ব্যাকুলতা — 'কি যে গো দারুণ ব্যথা আমার এ বুকময়/ কি দারুণ ব্যথায় যে পুড়িতেছে এ হৃদয়। /নীরবে হৃদয়ে আছে হায় সে অনন্ত ব্যথা।/ একটি দিনের তরে বলিনি একটি কথা।" 'প্রেমগাথা' কাব্যের 'প্রেম' কবিতায় কবি প্রেমের সম্মোহিনী শক্তির কথা — প্রেমের জাদুর কথা ব্যক্ত করেছেন — 'মনে করি ভুলেছি তোমায়,/ মনে হয় কাছে এলে/ দেখিব না আঁখি মেলে,/দেখা হলে চলে যাব আনত মাথায়! / আজু কেন টানে প্রাণ মন? /কোন মন্ত্র হেন আছে/ শতদূর — করে কাছে/ভাঙা বীণা সপ্তমেতে বাজায় এমন! / (আমি জানি প্রেম সে গো, নহে অন্য জন)। 'অমিয়গাথা' কাব্যের 'প্রিয় সম্বোধনে' কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে নয়ন মেলে দেখব তারে'র মতো আকুলতা - ''কি মদিরা ঝরে সখে! নয়নে তোমার!/হেরিলে পাগল হই/ আমি যে আমি নই,/ ত্রিজগত পলকেতে হয় একাকার!'

সরোজ কুমারী দেবি মহিলা কবিদের মধ্যে প্রেম কবিতার ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। তাঁর 'হাসি ও অশ্রু' (১৮৯৪) কাব্যটি এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য । চুম্বনের উপর সরোজকুমারী যে দুটি কবিতা লিখেছেন, তাতেই তাঁর প্রেম ভাবনার বিশিষ্টতা প্রকাশ পেয়েছে। আলোচ্য কবিতা দুটিতে আদর্শায়িত প্রেমের অভিব্যক্তি ধরা পড়েছে। এখানে কবি 'বস্তুকে পরিহার করিয়া বিরহের ভাবটিকে গ্রহণ

করিয়াছেন'। 'একটি চুম্বন' কবিতায় কবি বলেছেন — 'চলে যায় পুন ফিরি এসে / হাতে তার ধরে নিজ করে/থর থর কাঁপিল অধর/ আঁখি কোণে দুটি অশ্রু ঝরে / ..... কুসুমের মত গেল ঝরে। ..../ ধীরে ধীরে একটি চুম্বন,/ অশ্রু জল ফুতে উঠে হাসি/বরষাতে রবির কিরণ!" আবার 'দুটি চুম্বন' কবিতায় কবি বলেছেন — 'আজ আমি এসেছি আবার ! / কি দিব তমায় ভাই, কিছুই ভেবে না পাই/ লহ দুটি দীন উপহার।/ ও রাঙা অধর দুটি, লাজ-বাঁধে গেছে টুটি,/ কি মোহেতে মুগ্ধ নয়ন;/ আপনারে গেছি ভুলি, চাও গো মুখ খানি তুলে/ ধর সখি দুইটি চুম্বন!"

উনিশ শতকের অন্যতম মহিলা কবি প্রিয়ংবদা দেবী। তিনি জীবনের দুঃসহ অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছেন যে প্রেম ফুলের মতই সুন্দর অথচ ক্ষণপ্রাণ। তাই ফুল ঝ'রে গেলে যেমন তার সৌরভে বাতাস ভ'রে থাকে তেমনি প্রেমাস্পদ গত হলেও প্রেমের উত্তররাগ 'প্রিয়জনের মনের কোণে শরত সন্ধ্যামেঘে' লেগে থাকে। সেই পুষ্পসৌরভের প্রেমের স্মৃতি, প্রেমের বেদনার কাব্যই তিনি লিখতে বসেছেন।[১১] প্রেমের অজানা রহস্যের প্রতি বিস্ময় মিশ্রিত ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে প্রিয়ম্বদা দেবীর 'রেণু' কাব্যের 'বিরহ' নামক সনেটটিতে। যেখানে বর্ষণ ও ঝঞ্ঝামুখর সময়ে কবি মিলনের জন্য বিরহ অনুভব করেছেন - "মিলন ব্যকুল; রুদ্ধ ঘরে একা বসি/ অশ্রু আঁখি প্রাণে জাগে তব মুখ শশী/ তবু একবার এস নয়ন সমুখে/ বাহুবন্ধে তনুখানি গাঁথি লহ বুকে!'

প্রেমের আকর্ষণ যে দৈহিক উপভোগের উর্ধে মিলনের আকর্ষণ, এই ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে বিনয়কুমারী ধরের 'নির্ঝর' কাব্যে। এই কাব্যের 'দৃষ্টি' নামক সনেট কবিতায় কবি বলেন — 'হৃদয়ের সাথে বুঝি হৃদয়ের কথা। দোঁহারে টানিছে দোঁহে আপনার পানে, জানাইতে মরমের চির আকুলতা/এসেছি হৃদয় দুটি ভাসিয়া নয়ানে !/ গোপন প্রাণের দ্বার গেছে যেন খুলে,/ দোঁহার লুকানো আশা দেখিছে দোঁহায়/ উথলিছে প্রেমসিন্ধু আঁখি উপকূলে,/ভরে উঠে দরশের হরষ জ্যোৎস্নায়।' স্বর্ণকুমারী দেবীর খ্যাতি মূলত কথাসাহিত্যিক হিসাবে। কিন্তু তিনিও বেশ কিছু কবিতা রচনা করেছেন যা তাঁর 'কবিতা ও গান' (১৮৯৫) নামক কাব্যে সংকলিত। ইন্দ্রিয়াশ্রিত দাম্পত্য প্রেমের চিত্র অঙ্কনে কবি সিদ্ধহস্ত। অবশ্য তাঁর 'কেমনে ভুলি', 'ভাবিও না' , 'প্রতিদান' ,'নহে অবিশ্বাস', 'যামিনী' প্রভৃতি কবিতায় বিরহের রক্তরাগে মিলনের তীব্রতাকে বাড়িয়ে তুলেছে ।

বিহারিলাল চক্রবর্তী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রমুখ কবি নারী বন্দনামূলক কবিতা রচনা করলেও, নারীদের মনের মর্মকথা সেখানে প্রকাশ পায়নি, পাবার কথাও নয়। অথচ এই সময়ের মহিলা কবিরা বিরুদ্ধ পরিবেশেও নিজেদের অন্তরের কথা, তার ভাবনাগুলিকে কবিতার রসাবেদনে প্রকাশ করেছেন। হয়তো তাঁদের কবিতা উঁচুদরের নয়, হয়তো তাঁদের কবিতা সকলকে মুগ্ধ করতে পারেনি; কিন্তু তারা যে 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' মত্ত ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। উনিশ শতকের মহিলা কবিদের মধ্যে শক্তিশালি কবি কামিনী রায়ও জানতেন, তাঁর কবিতা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'ভাল করে জ্বলে ওঠেনি।' সে জন্যই তাঁর শেষের দিকের এক কবিতায় তিনি অভিমানের সুরে জানান - 'আমার ভাষণ যদি না লাগে মধুর,/ আমার গানেতে যদি নাহি পায় সুর তাতে কোনও ক্ষতি নেই, তিনি শুধু যে কথা এসেছেও মনে লিখিয়াছি সোজা/ মনের সহজ সুরে;..... কাহারো লেগেছে ভাল সেই সোজা সুর/ করুণ, নিভৃত-ব্যথা করিয়াছে দূর/ সমবেদনার রসে। .....যা পেয়েছি নম্র শিরে লয়েছি তুলিয়া/ দূরাগত শ্রদ্ধা প্রীতি বেদনা ভুলিয়া' (১৯৩০)। উনিশ শতকের মহিলা কবিরা সাহিত্যের দরবারে উচ্চাসন লাভ না করলেও, তারা যে খাঁটি কবি ছিলেন সে কথা বলাই যায়।

সূত্র নির্দেশ:

১। গোপা দে, উনিশ শতকের তিন নারী কবি, দে'জ প্রথম প্রকাশ : আগস্ট, ২০১০, কলকাতা, পৃঃ ৩৭।
২। রাসসুন্দরী দাসী, আমার জীবন, দে বুক স্টোর, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৫৯, পৃঃ ২২।
৩। অলোক রায়, কামিনী রায়: আলো ও ছায়ার কবি দেশ পত্রিকা, বই সংখ্যা, ২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪, পৃঃ ৬৫।
৪। গোপা দে, উনিশ শতকের তিন নারী কবি, দে'জ প্রথম প্রকাশ : আগস্ট, ২০১০, কলকাতা, পৃঃ ৪৫।
৫। অলোক রায়, কামিনী রায়: আলো ও ছায়ার কবি, দেশ পত্রিকা, বই সংখ্যা, ২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪, পৃঃ ৬৪-৬৫।
৬। গোপা দে, উনিশ শতকের তিন নারী কবি, দে'জ, প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০১০, কলকাতা, পৃঃ ১৩৪।
৭। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বঙ্গের মহিলা কবি, দে'জ, দ্বিতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ১৯৫৩, কলকাতা পৃঃ ১৩৩।
৮। সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস(৩য় খণ্ড), আনন্দ, সপ্তম সংস্করণ ১৩৮৬, ষষ্ঠ মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ, ১৪১৪, কলকাতা, পৃঃ ৪২৪।
৯। অলোক রায়, কামিনী রায়: আলো ও ছায়ার কবি, দেশ পত্রিকা, বই সংখ্যা, ২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪, পৃঃ ৬৮।
১০। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য, পরিবর্ধিত পরিমার্জিত দে'জ সংস্করণ : জানুয়ারি ১৯৯৭, কলকাতা, পৃঃ ১৩৪।
১১। মধুমিতা চক্রবর্তী, ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা কাব্যে নারী চেতনার স্বরূপ; ড.সত্যবতী গিরি ও সমরেশ মজুমদার (সম্পাদিত), প্রবন্ধ সঞ্চয়ন, রত্নাবলী দ্বিতীয় সংস্করণ / দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৫ এপ্রিল ২০০৯, কলকাতা, পৃঃ ৪৩১-৪৩।